দ্য লাস্ট মোগল

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ, যা ইতিহাসে 'সিপাহি বিদ্রোহ' হিসেবে খ্যাত, সেই যুদ্ধের পূর্বাপর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনেক উপকরণের প্রতি কোনো ইতিহাসবিদ দীর্ঘদিন পর্যন্ত তেমন মনোযোগ দেননি। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল তার দীর্ঘ চার বছরের গবেষণায় সেসব বিষয়বস্তুকে তুলে এনে 'দ্য লাস্ট মোগল: দ্য ফল অফ অ্যা ডাইন্যাস্টি: দিল্লি ১৮৫৭'-এ স্থান দেওয়ার ফলে বিদ্রোহ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে তার স্বভাবসুলভ বর্ণনারীতি সিপাহি বিদ্রোহের সেই দুর্ভাগ্যজনক মাসগুলোকে পাঠকের সামনে জীবন্ত করে হাজির করেছে। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের শেষ দিনগুলোকে কেন্দ্র করে রচিত ড্যালরিম্পেলের গ্রন্থটি ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যে অন্যতম সংযোজন। এই নাটকীয় ও বিয়োগান্তক ঘটনাকে তিনি বর্ণনা করেছেন সাহিত্যিক সৃজনশীলতা, পাণ্ডিত্য এবং নতুন উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়ে।

সম্ভবত প্রথমবারের মতো সিপাহি বিদ্রোহে ব্রিটিশ নৃশংসতা, বিশেষ করে দিল্লির পতনের পর নগরবাসীর ওপর তারা যে হিংস্রতায় প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের সর্বস্ব লুট করেছে তা তিনি তুলে ধরেছেন মানবিক আবেগ-অনুভূতি দিয়ে। বিদ্রোহের শুরুতে দিল্লিতে বসবাসরত ব্রিটিশ মহিলারা ধর্ষিত হয়েছিল বলে দীর্ঘকাল ধরে যে অপবাদ বিদ্রোহী সিপাহিদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল, ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তিনি তা খণ্ডন করেছেন। বাহাদুর শাহ জাফর বরং নগরীর ব্রিটিশ নারী-পুরুষ ও শিশুদের প্রাসাদে আশ্রয় দিয়ে বিদ্রোহীদের হুমকি সত্ত্বেও হত্যা করার জন্য তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ, ইসলামের বিধান অনুসারে ঠান্ডা মাথায় কোনো মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবতাকে হত্যা করার শামিল। যুদ্ধ চলাকালেও সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে, এমনকি পানির উৎস, খাদ্যশস্য ও ফসলের মাঠ ধ্বংস করতেও ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদশাহ জাফর তার আশ্রিতদের রক্ষা করতে পারেননি। দিল্লির পতনের পর তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রহসনের বিচার করে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

বাহাদুর শাহ জাফর হয়তো ইসলামের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন যে, মহান সালাহউদ্দিন খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের পরাজিত করে জেরুসালেম পুনর্দখল করার যুদ্ধে এবং নগরী পুনর্দখল করার পরও সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি করেননি, বরং নগরীর খ্রিষ্টানদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অথচ জেরুসালেম যখন ক্রুসেডারদের হাতে পড়েছিল তখন মুসলমানদের রক্তে নগরীর রাস্তা ভেসে

গিয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ বাহিনীও দিল্লিতে নজিরবিহীন হত্যালীলা চালিয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কমই আছে।

সন্দেহ নেই, মোগলদের অবক্ষয়ের পরিণতি ছিল ব্রিটিশ কর্তৃক এদেশকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করা। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের গবেষণায় আরও একটি বিষয় গুরুত্ব লাভ করেছে যে তখনকার মুসলিম সংস্কারকগণ, বিশেষ করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী মোগল রাজপরিবার ও দরবারিদের অধঃপতনের নিন্দায় সোচ্চার ছিলেন, যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে জড়িয়ে পড়েছিল ব্যভিচার, মিথ্যাচার, চক্রান্ত করাসহ সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ডে।

মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে বহুল আলোচিত 'সভ্যতার সংঘাত' প্রসঙ্গে 'দ্য লাস্ট মোগল'-এর লেখক ড্যালরিম্পেল তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের অতি উৎসাহ এবং ভারতের বাসিন্দাদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার লক্ষ্য সিপাহি বিদ্রোহের বড় একটি কারণ ছিল।

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল লেখক হিসেবে কাজ শুরু করেন ভ্রমণকাহিনি দিয়ে। কিন্তু কোনো বিষয়ের মূলে পৌঁছার জন্য তার প্রচেষ্টা তাকে যথার্থই একজন ইতিহাসবিদে পরিণত করেছে। ইতঃপূর্বে আমি তার দুটি গ্রন্থ 'সিটি অব জিনস' ও 'হোয়াইট মোগলস' অনুবাদ করেছি। ভ্রমণের নেশা তাকে সাধারণ পর্যটকের চোখে দেখে সাধ মেটানোর কৌতূহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি বলেই তার পক্ষে ইতিহাসবিদদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া কিংবা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার মতো বিবেচিত হওয়া উপকরণগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদদের চেয়েও অধিক অবদান রেখেছেন। তার বর্ণনাভঙ্গি, ভাষার সাবলীলতা ইতিহাসের মতো বিষয়কেও সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ করেছে এবং এজন্য তিনি নন্দিত হয়েছেন।

'দ্য লাস্ট মোগল' নিঃসন্দেহে ড্যালরিম্পেলের সেরা একটি কাজ। পদস্থ অফিসার ও সাধারণ সৈনিক, অভিজাত ব্যক্তি ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ, হতোদ্যম যুবরাজ ও আশাহত মিথ্যাবাদীদের পটভূমি থেকে তিনি ১৮৫৭ সালে সংঘটিত ঘটনাবলি দেখেছেন। বিদ্রোহে জড়িত যে চরিত্রগুলোকে তিনি তার শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে বের করে আনতে পেরেছেন, ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সেই চরিত্রগুলোকে পাঠকের সামনে জীবন্ত করে উপস্থিত করেছেন। তার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যের কারণেই পাঠক নিজেকে বিদ্রোহের সময়ে কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দেখতে পায়, যেন মহান মোগলদের পতন তাদের উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছে।

এ ধরনের একটি গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি যে, সিপাহি বিদ্রোহ, যা এদেশবাসীর কাছে ছিল ব্রিটিশ গোলামির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু এই নজীরবিহীন সংগ্রামের ওপর বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ কোনো গ্রন্থ নেই। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের 'দ্য লাস্ট মোগল'-এর বাংলা অনুবাদ সেই ঘাটতি পূরণ করবে বলে আশা করি।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র ৩৯
প্রথম অধ্যায়
তাসের রাজা ৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়
বিশ্বাসী এবং বিধর্মী ৮৬
তৃতীয় অধ্যায়
অস্বস্তিকর এক ভারসাম্য ১১৩
চতুর্থ অধ্যায়
ঝড় এগিয়ে আসছিল ১৪১
পঞ্চম অধ্যায়
ক্রোধের প্রভুর তরবারি ১৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়
ধ্বংস ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিন ২১৯
সপ্তম অধ্যায়
বিপজ্জনক পরিস্থিতি ২৫৫
অষ্টম অধ্যায়
রক্তের বদলে রক্ত ২৮০
নবম অধ্যায়
পালটা তরঙ্গ ৩২৮
দশম অধ্যায়
প্রতিটি লোককে গুলি করার নির্দেশ ৩৬৯
একাদশ অধ্যায়
মৃতের নগরী ৪১৬
দ্বাদশ অধ্যায়
শেষ মোগল সম্রাট ৪৭১

ভূমিকা

১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসে, বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার পর রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন) শীতের আর্দ্রতার মধ্যে বিকেল চারটায় কাফন পরানো একটি মৃতদেহ প্রহরা দিয়ে ছোট্ট একদল ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে গেল কারা-বেষ্টনীর পেছনের দিকে অজ্ঞাত এক কবরে দাফন করতে।

কারা-প্রাচীরের ওপর দিয়ে রেঙ্গুন নদীর ঘোলা পানি এবং একটু ভাটির দিকে পাহাড়ি অবস্থানে দেখা যায় শেও ডাগন প্যাগোডার প্যাঁচানো চূড়া। কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্দরের নতুন সেনানিবাস। বন্দর ও প্যাগোডার জন্য খ্যাত নগরীটি ব্রিটিশ বাহিনী মাত্র দশ বছর আগে দখল করেছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জ্বালিয়ে দিয়েছে। যে মৃতদেহের উল্লেখ করা হয়েছে সেটি এক রাজবন্দির এবং তার খাটিয়া অনুসরণ করছে তার দুই পুত্র এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ মোল্লা। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে কোনো মহিলার উপস্থিতি অনুমোদিত নয়। বাজারের কিছু লোক, যারা কোনোভাবে বন্দির মৃত্যুর খবর পেয়েছে তারা এসে ভিড় করায় সশস্ত্র প্রহরীরা তাদেরকে একটু দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। তবুও দু-একজন লোক প্রহরীদের বেষ্টনী ডিঙিয়ে মৃতদেহ কবরে নামানোর আগে তা স্পর্শ করেছে।

অনুষ্ঠানটি ছিল সংক্ষিপ্ত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ কবরস্থ করার মধ্যদিয়ে শুধু নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল তা নয়, বরং খাটিয়া ও মৃতদেহের দ্রুত ক্ষয় নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চুনও সংগ্রহ করে রেখেছিল। সংক্ষিপ্ত জানাজা শেষে কোনো শোক প্রকাশ ও বিলাপ করার সুযোগও না দিয়ে কবরে চুনের আস্তরণের ওপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। এছাড়া ঘাসের চাপড়া বসানো হলো কবরের ওপর যাতে এক মাসে বা আরও কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কবরটির কোনো নিশানা মাত্রও না থাকে। এক সপ্তাহ পর ব্রিটিশ কমিশনার ক্যাপ্টেন এইচ এন ডেভিস ঘটনার বিবরণ দিয়ে লন্ডনে রিপোর্ট পাঠান: "অবশিষ্ট রাষ্ট্রীয় বন্দিরা, এশীয় হারেমের মহিলারা ভালোভাবে

আছেন। শয্যাশায়ী বৃদ্ধ লোকটির মৃত্যুতে পরিবারটির মধ্যে কোনো প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। তার মৃত্যু স্পষ্টতই শারীরিক জরাজীর্ণতা ও গলার একটি অংশে পক্ষাঘাতজনিত কারণে হয়েছে। যেদিন ভোর পাঁচটায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেদিনই তার শেষকৃত্য হয়। সম্ভবত কিছু উগ্র ধর্মান্ধ, যারা শেষকৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে প্রার্থনা করেছে, তারা ছাড়া রেঙ্গুনের জনগোষ্ঠীর মুসলিম অংশের ওপর সাবেক বাদশাহর মৃত্যুর কোনো প্রভাব পড়েনি বলা যেতে পারে। কবর ঘিরে বেশ খানিকটা দূরে বাঁশের বেড়া তৈরি করা হয়েছে, যেটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সময়ের মধ্যে কবরের জায়গাটির ওপর ঘাস গজিয়ে যাবে এবং মহান মোগলদের শেষ ব্যক্তিটির শেষ বিশ্রামস্থল শনাক্ত করার আর কোনো উপায় থাকবে না।"

ডেভিস যে রাষ্ট্রীয় বন্দির উল্লেখ করেছেন তিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যার জনপ্রিয় নাম ছিল জাফর অর্থাৎ বিজয়। জাফর ছিলেন শেষ মোগল সম্রাট এবং চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সরাসরি বংশধর। ১৭৭৫ সালে তার জন্ম, যখন ভারতে ব্রিটিশ অবস্থান তেমন দৃঢ় নয় এবং প্রধানত উপকূলীয় শক্তি হিসেবে তারা বিরাজ করছিল। মূল ভূখণ্ডের তিনটি স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল তাদের অবস্থান। জাফর তার জীবদ্দশাতেই নিজ বংশের শাসনকে অবমাননাকর পর্যায়ে নেমে যাওয়া এবং একই সাথে ব্রিটিশদেরকে সামান্য বণিক থেকে আগ্রাসি সম্প্রসারণবাদী সামরিক শক্তিতে পরিণত হওয়া প্রত্যক্ষ করেন।

জাফর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন বেশ বিলম্বে। ষাটোর্ধ্ব বয়সে তিনি যখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন তখন মোগলদের রাজনৈতিক পতন ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তার দরবারে অনেক মেধাবী লোকের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার বংশের সবচেয়ে মেধাসম্পন্ন ও সহনশীল প্রকৃতির শাসকদের অন্যতম ছিলেন। তার মাঝে ছিল দক্ষ লিপিকার, সুফিবাদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক, মোগল মিনিয়েচার চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক এবং উদ্যান তৈরির অনুপ্রেরণা দানকারী ও শৌখিন স্থপতি। তার সকল গুণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি ছিলেন একজন সুফি কবি, যিনি শুধু উর্দু ও ফারসি ভাষায় নয়, ব্রজভাষা ও পাঞ্জাবিতেও কবিতা রচনা করেছেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রেনেসাঁর জন্য তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি নিজে অনেক চমৎকার ছন্দময় গজল লিখেছেন এবং তার সময়ের ভারতের

বিখ্যাত কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, যাদের মধ্যে ছিলেন গালিব ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী জওক।

ব্রিটিশরা অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা একের পর এক সংকুচিত করে চলেছিল—মুদ্রা থেকে তার নাম উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দিল্লি নগরীর ওপর তারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মোগল রাজপরিবারের সকলকে লালকেল্লা থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করছিল, তখন বাহাদুর শাহ জাফরের দরবার আচ্ছন্ন ছিল গজল চর্চায় এবং চমৎকার উর্দুতে লেখা কবিতা নিয়ে আলোচনায়। রাজনৈতিক গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মোগল দরবার হারিয়ে গেল প্রমোদ উদ্যান, বাইজিদের নাচ ও মুশায়রা, সুফিবাদের প্রতি আকর্ষণ, পিরের দরগা জিয়ারতের শেষ পটভূমিতে, যেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্থান দখল করে নিল সাহিত্য ও ধর্মীয় অভিলাষ।

এ সময়ে লালকেল্লায় সংঘটিত ঘটনাবলির নিবিড় বর্ণনা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের পক্ষে দিনপঞ্জি হিসেবে সংরক্ষণ করত একজন বার্তা লেখক, যে দিনপঞ্জি বর্তমানে 'ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়া'য় সংরক্ষিত রয়েছে, যাতে জাফরের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে শেষ মোগল সম্রাটকে একজন অত্যন্ত বিনয়ী ও নির্দোষ স্বভাবের বৃদ্ধ লোক বলে মনে হয়, এমনকি ব্রিটিশরা যখন তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করছিল তখনো তার অমায়িক ভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পায়ের ব্যথা উপশমের জন্য প্রতিদিন তার পায়ে জলপাই তেল মালিশ করা হতো। মাঝে মাঝে তিনি বাগানে বেড়াতে যেতেন। শিকার অভিযানে বের হতেন অথবা মুশায়রার আয়োজন করতেন। সন্ধ্যাগুলো অতিবাহিত হতো চাঁদের আলো অবলোকন করে, গান শুনে অথবা সদ্য আহরিত পাকা আম খেয়ে। বৃদ্ধ সম্রাট সবসময় চেষ্টা করতেন তার তরুণী রক্ষিতাদের অবিশ্বস্ততামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখতে, যাদের মধ্যে অন্তত একজন দরবারের একজন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী কর্তৃক গর্ভধারণ করেছিল।

১৮৫৭ সালের মে মাসের এক সকালে তিনশ বিদ্রোহী সিপাহি ও অশ্বারোহী মিরাটে অবস্থানরত খ্রিষ্টান নরনারী ও শিশুদের যাকে পেয়েছে তাদেরকে হত্যা করে দিল্লিতে চলে আসে এবং বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের নেতা ও সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। জাফর কোনোভাবেই ব্রিটিশের বন্ধু ছিলেন না, যারা তাকে তার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল এবং প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে নিপীড়নের শিকারে পরিণত করত। অথচ জাফর কোনো অর্থেই সহজাত বিদ্রোহী ছিলেন না। গুরুতর এক পরিস্থিতির

শিকার হয়ে এবং অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন বিদ্রোহের নামেমাত্র নেতা হিসেবে, যে বিদ্রোহ সম্পর্কে শুরু থেকেই তার ধারণা ছিল যে, এটি সফল হবে না। কারণ বিদ্রোহীরা ছিল দলপতিহীন একটি বাহিনী, যার সদস্যদের অধিকাংশই বিনা বেতনের কৃষক, অথচ তাদেরকে লড়তে হবে বিশ্বের সেরা সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে, যদিও ইতোমধ্যে বেঙ্গল আর্মির ভারতীয় সিপাহিরা একটি যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাভূত করেছিল।

বিখ্যাত মোগল রাজধানী যখন সাংস্কৃতিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য একটি পর্যায়ে উপনীত, তখনই তা রাতারাতি পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। বিদ্রোহীদের সমর্থন বা হস্তক্ষেপ করার মতো অবস্থা কোনো বিদেশি সেনাবাহিনী ছিল না। বিদ্রোহীদের গোলাবারুদ ছিল সামান্য, কোনো অর্থ ও রসদের সরবরাহ ছিল না। নগরীর বাইরে যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা নগরী অবরোধের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যায় এবং সরবরাহ মারাত্মক হ্রাস পায়। শিগ্‌গিরই দিল্লিবাসী ও সিপাহিরা ক্ষুধায় কাটানোর অবস্থায় উপনীত হয়।

দিল্লি অবরোধ ব্রিটিশের জন্যে ছিল স্টালিনগ্রাদের অবরোধের মতো। দুটি শক্তির জন্যই জীবন মরণের লড়াই, কারো পিছু হটার উপায় নেই। নিহতের সংখ্যা অকল্পনীয় এবং উভয় পক্ষে সৈন্যরা শারীরিক ও মানসিক সহ্যশক্তির চরম এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশরা তড়িঘড়ি করে সংগ্রহ করা শিখ ও পাঠানদের মিলিত বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে দিল্লি নগরী দখল, ধ্বংস ও লুণ্ঠন এবং নগরবাসীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে হত্যা করে। কাঁচা চালান নামে একটি মহল্লাতেই হত্যা করা হয় ১৪শ লোককে। উনিশ বছর বয়স্ক ব্রিটিশ অফিসার এডওয়ার্ড ভাইবার্ট লেখেন, "নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি লোককে হত্যা করার। প্রকৃত অর্থেই এটি ছিল হত্যাকাণ্ড....আমি অনেক রক্তাক্ত ও বীভৎস দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু গতকাল যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি, প্রার্থনা করি যে আমাকে যাতে আর কখনো এমন দৃশ্য দেখতে না হয়। হত্যালীলা থেকে মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের স্বামী ও পুত্রদের চোখের সামনে হত্যা করা হচ্ছে, এ দৃশ্য দেখে তারা যেভাবে আর্তনাদ করছিল তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক....ঈশ্বর সাক্ষী, আমিও কোনো করুণা অনুভব করিনি, কিন্তু যখন পাকা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধকে আনা হলো এবং আমার চোখের সামনে গুলি করে মারা হলো, আমার বিশ্বাস কঠিন হৃদয়ের অধিকারী লোকও তা দেখে স্থির থাকতে পারবে না....।"

নগরবাসীদের যারা জীবন রক্ষা করতে পেরেছিল তাদেরকে নগরী থেকে বিতাড়ন করা হলো। দিল্লি পড়ে রইল জনশূন্য ধ্বংসস্তূপ হিসেবে। রাজপরিবার যদিও শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল, বাদশাহর ষোলোজন পুত্রের অধিকাংশকেই গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয় এবং ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। তিনজন রাজপুত্রকে একেবারে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। যদিও তারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছিল, কিন্তু তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় সকল বস্ত্র ত্যাগ করতে। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হাডসন পরদিন তার বোনকে লেখেন, "২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি তাতার জাতির তৈমুর বংশের প্রধান সদস্যদের নির্মূল করেছি। আমি নিষ্ঠুর নই, কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, পৃথিবীকে এই দুষ্ট ক্ষতগুলোর কবল থেকে রক্ষা করার সুযোগ আমি উপভোগ করেছি।"

টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেলও দর্শনার্থীদের একজন ছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, বন্দি পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদের প্রতিরোধে সশস্ত্র লড়াই এর প্রধান মদতদাতা। রাসেলের বর্ণনা অনুসারে, "আধ বোজা, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ তিনি, যার নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে এবং মাড়ি দাঁতবিহীন। তিনি কি আসলেই বিশাল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সেনা বিদ্রোহের ইন্ধন কি তিনিই জুগিয়েছেন? তার ঠোঁট দিয়ে একটি শব্দও বের হয় না। মাটির দিকে চোখ নিবদ্ধ করে দিনরাত তিনি নীরবে তাকিয়ে থাকেন, যেন যে অবস্থায় তাকে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন।....তার দৃষ্টিতে বার্ধক্যের নিরাসক্ত ভাব...। অনেকে তাকে তার নিচের রচিত কবিতা আওড়াতে শুনেছে, কাঠকয়লা দিয়ে তিনি প্রাচীরে কবিতা লিখেছেন।" জনৈক ব্রিটিশ অফিসারের মতে, "তিনি খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মতো, যাকে দর্শনার্থীদের কাছে দেখার বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।"

জাফরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে হাওয়ার্ড রাসেল সে সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তিনি লেখেন, "কল্যাণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাকে অকৃতজ্ঞ বলা হচ্ছে। সন্দেহ নেই যে তিনি একজন দুর্বল ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধ। কিন্তু যিনি দেখেছেন যে, শুধুমাত্র শূন্য একটি উপাধি, ততোধিক শূন্য কোষাগার এবং কপর্দকহীন শাহজাদায় পূর্ণ প্রাসাদ ছাড়া তার পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্যের সবকিছু ক্রমান্বয়ে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাকে অকৃতজ্ঞ হিসেবে চিত্রিত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

তদুপরি পরের মাসেই তার পুরোনো প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাকে বিচারের মুখোমুখি করে দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হয়। একটি গরুর গাড়িতে উঠে তিনি তার প্রিয় নগরী দিল্লি ছেড়ে যান। তিনি যা কিছু ভালোবাসতেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ৮৭ বছর বয়সে ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর নির্বাসিত অবস্থায় রেঙ্গুনে মৃত্যুবরণ করেন।

বাহাদুর শাহের দিল্লি ত্যাগের সাথে সাথে ভঙ্গুর দরবারি সংস্কৃতিও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এ সম্পর্কে মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব লিখেছেন, "যতদিন বাদশাহ ছিলেন ততদিনই শুধু এসব টিকে ছিল।" তার মৃত্যুর সময়ের মধ্যে তার প্রাসাদের অধিকাংশ, লালকেল্লা, খসে খসে পড়ছিল। নগরীর যে এলাকাগুলোর তিনি সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন, সেগুলোও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নগরীর বিশিষ্ট বাসিন্দা, দরবারি কবি ও শাহজাদা, মোল্লা ও ব্যবসায়ী, সুফি ও পণ্ডিতদের খুঁজে বের করে ফাঁসিতে ঝুলোনো হয় এ সময়ের মধ্যে। অনেককে বিতাড়ন করা হয়, নির্বাসনে পাঠানো হয়। অনেকেই প্রেরিত হন আন্দামানে ব্রিটিশরাজের নতুন সৃষ্ট কারাগারে। যাদের এসবের বাইরে রাখা হয় তারা পতিত হয় নিদারুণ অবমাননাকর পরিস্থিতিতে এবং সীমাহীন দারিদ্র্যে। পুরোনো দরবারের অল্প যে ক'জন জীবিত ছিলেন তাদের একজন গালিব। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, "ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহর পুরুষ বংশধরদের যারা তরবারির আঘাতের শিকার হয়নি তারা মাসে পাঁচ রুপি করে ভাতা উত্তোলন করে। মহিলা সদস্যদের মধ্যে বৃদ্ধাদের পরিণত করা হয় বেশ্যাদের মাসিতে, আর তরুণীদের বেশ্যায়। নগরী রূপান্তরিত হয়েছে মরুভূমিতে...। হে ঈশ্বর, দিল্লি আর নগরী নেই, একটি শিবির, সেনাছাউনিতে পরিণত হয়েছে। কোনো কেল্লা, নগরী, বাজার, ফোয়ারা পর্যন্ত নেই....। চারটি বস্তু দিল্লিকে জীবন্ত রেখেছিল— কেল্লা, জুমা মসজিদে প্রতিদিন জড়ো হওয়া মুসল্লি, যমুনার ওপর তৈরি নৌকার সেতুর ওপর সপ্তাহে একদিন পায়চারি করা এবং ফুলওয়ালিদের বার্ষিক উৎসব। এসবের কোনো কিছুর অস্তিত্ব আর নেই। তাহলে কীভাবে দিল্লি টিকে থাকে? হ্যাঁ, বলা হয়ে থাকে যে ওই নামে হিন্দুস্তানে এককালে এক নগরী ছিল....

"আমরা সুরা পাত্র ও বোতল ভেঙে ফেলেছি
আমাদের কাছে এখন কী আর আছে,
বেহেশত থেকে যদি সব বৃষ্টিও ঝরে
তাহলে তা কি গোলাপ-লাল সুরা হবে?"

যদিও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ অর্থাৎ শেষ মোগল সম্রাট এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু এটি তার জীবনী নয়। দিল্লিকে কেন্দ্র করে তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে এবং পাশাপাশি মোগল রাজধানীর শেষ দিনগুলো ও ১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ে নগরীর চূড়ান্ত ধ্বংস সাধনের বর্ণনাও উঠে এসেছে। বিগত চারটি বছর (২০০৬ সালের নভেম্বরে গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত) আমি এ বিষয়ে গবেষণা ও লেখার কাজে ব্যয় করেছি। বাহাদুর শাহ জাফরের চিঠিপত্র এবং তার দরবারের বিবরণী লন্ডনে, লাহোরে, এমনকি রেঙ্গুনের মহাফেজখানাগুলোতে পাওয়া গেলেও এখন পর্যন্ত অধিকাংশ উপকরণ জাফরের সাবেক রাজধানী দিল্লিতেই রয়েছে, যে নগরী দুই দশকের বেশি সময় যাবৎ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

১৯৮৪ সালের ২৬ জানুয়ারি শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে আঠারো বছর বয়সে আমি প্রথমবার দিল্লিতে আসি। বিমানবন্দরে শাল জড়ানো লোকজন গুটিশুটি মেরে ছিল এবং শীত ছিল প্রচণ্ড। ভারত সম্পর্কে আমি কোনোকিছু জানতাম না। আমার শৈশব কেটেছে স্কটল্যান্ডের গ্রামে সাগরের উপকূলে এবং আমার স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরা সম্ভবত খুব কম ভ্রমণ করেছে। আমার বাবা মা অত্যন্ত নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা অকল্পনীয় ধরনের মনোরম একটি স্থানে বাস করছেন, অতএব, বসন্তকালে স্কটল্যান্ডের পার্বত্য একটি এলাকায় বছরে একবার বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের খুব কমই অবকাশ যাপনে নিয়ে গেছেন। যে পার্বত্য এলাকায় আমাদের নিয়ে যেতেন সেটি আমাদের বাড়ির চেয়ে বেশি ঠান্ডা ও আদ্র। সম্ভবত, এ কারণেই আমার ওপর দিল্লির প্রভাব ছিল দারুণ উপভোগ্য, কসমোপলিটন পরিবেশে বড় হওয়া তরুণদের চেয়েও অধিক। দিল্লি নগরী শুরু থেকেই আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে। আমি কয়েক মাস পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে দিল্লিতে ঘুরেছি। এরপর গোয়ায় গেছি, কিন্তু শিগ্‌গিরই দিল্লিতে ফিরে এসে পুরোনো নগরী থেকে বেশ খানিকটা উত্তরে মাদার তেরেসা হোমে একটি চাকরিতে যোগ দিয়েছি।

বিকেলে রোগীরা যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকত, আমি তখন বেরিয়ে পড়তাম। একটি রিকশা নিয়ে পুরোনো দিল্লির সরু অলিগলি চষে বেড়ানোর সময় আমার চারপাশের বাড়িঘরগুলোকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুভব করতাম। বিশেষ করে জাফরের প্রাসাদ, মোগলদের বিখ্যাত লালকেল্লায় যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা আমাকে পেছনে টেনে রাখত। প্রায়ই আমি একটি বই সাথে নিয়ে সেখানে যেতাম এবং কোনো শীতল অট্টালিকার ছায়ায় বসে পুরো বিকেল কাটিয়ে দিতাম। শিগ্‌গিরই মোগলদের প্রতি আমার আগ্রহের সৃষ্টি

হলো, যারা একসময় সেখানে বাস করত। পাশাপাশি তাদের সম্পর্কে ক্ষুধার্তের মতো পাঠ করতে শুরু করলাম। এখানেই মোগলদের একটি ইতিহাস লেখার কথা প্রথম আমার ভাবনায় আসে, যা এখন চার খণ্ডে মোগল বংশের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এটি শেষ করতে আমার আরও দুই দশক লাগবে বলে মনে হয়।

যখনই আমি লালকেল্লা পরিদর্শন করি, সবসময় এই স্থাপনা আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা লালকেল্লা দখলের পর জাঁকজমকপূর্ণ হারেম ভবনগুলো ভেঙে ফেলে এবং সেই স্থানে তৈরি করা হয় ব্যারাকের সারি। যখন ভবনগুলো ধ্বংস করা হয় তখনো এই কার্যকে বিবেচনা করা হয়েছে সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক হিসেবে। ভিক্টোরীয় স্থাপত্যকর্ম বিষয়ক বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জেমস ফার্গুসন কোনো বিচারেই উদারপন্থি বলে বিবেচিত না হলেও তিনি তার 'হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার' গ্রন্থে মোগল স্থাপত্যকর্মের ধ্বংসের প্রতিবাদ জানান। তার মতে, "যারা নির্বিচারে এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তারা একটি পরিকল্পনা করার কথাও ভাবেনি যে তারা কী ধ্বংস করছে, অথবা বিশ্বের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদের বিবরণ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও ভাবেনি....। প্রকৌশলীরা ধারণা করেছে যে প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা বিনা খরচে ব্যারাকের চারপাশ ঘিরে রাখার মতো একটি প্রাচীর ডিঙানো সম্ভব হবে না এবং এ কারণে, অথবা অন্য কোনো বাজে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রাসাদকে উৎসর্গ করতে হয়েছে।....এ কাজের সাথে আধুনিককালের একটি ধ্বংসকর্মের তুলনা করা যেতে পারে, তা হচ্ছে পেকিনের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের ধ্বংস সাধন। সেটি করা হয়েছে যুদ্ধের কারণে, আর মোগল প্রাসাদ ধ্বংস করা ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রয়োজনীয় নাশকতা।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্মিত ব্যারাকগুলো বহু বছর আগেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লালকেল্লার বর্তমান মালিক, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্রিটিশদের উদ্যোগকেই চালু রেখেছে যে, কী করে দুর্গের আরও অবক্ষয় সম্ভব। শ্বেত মর্মরে নির্মিত ভবনগুলোর কোনো যত্নই এখন আর নেওয়া হয় না, যাতে সেগুলো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দ্রুততর হয়, ভবনের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, পানির ধারাগুলোও আগের অবস্থায় নেই এবং সেখানে ঘাস ছেয়ে আছে, ফোয়ারাগুলো শুকিয়ে গেছে। শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর ব্যারাকগুলোই ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বিগত বিশ বছরের অধিক সময় ধরে আমি লন্ডন ও দিল্লির মধ্যে আমার সময় ভাগ করে নিয়েছি এবং ভারতের রাজধানী আমার প্রিয় নগরী হিসেবেই রয়ে গেছে। সর্বোপরি অতীতের সাথে এই নগরীর সম্পর্ক আমাকে আরও কৌতূহলী করে তুলেছে। ঐতিহাসিক বিষয়ের পরিমাণ ও নিদর্শনের বিপুলতার দিক থেকে দিল্লির সাথে তুলনা করা যেতে পারে কেবল রোম, ইস্তাম্বুল ও কায়রোকে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়ছে, এমন সৌধ, প্রাচীন মসজিদ অথবা পুরোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ এমন সব জায়গায় দেখা যায়, যা সেখানে থাকতে পারে বলে ধারণাও করা যায় না। রাস্তার কোনো মোড়ের পাশে, পৌর উদ্যানে অথবা গলফ কোর্সের কোনো জঙ্গলের মাঝে সহসাই চোখে পড়বে এমন নিদর্শন। নয়া দিল্লিও আসলে নতুন নয়, বরং বলা যায় প্রাচীন নগরী, যেখান থেকে উঠছে যন্ত্রণার কাতরানি। নয়া দিল্লি জুড়ে এত নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা কোনো ইতিহাসবিদকে বহুরূপে বহুকাল ধরে ব্যস্ত রাখতে পারে।

দিল্লির এসব ধ্বংসস্তুপ দেখে যে শুধু আমিই বিস্মিত হয়েছি তা নয়। এগুলোর এমনই আকর্ষণ যে দর্শনার্থীরাও বিস্মিত না হয়ে পারে না। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে এই নগরী ক্ষয়িষ্ণুতার চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং তখন থেকেই যেন দিল্লি বিষণ্ন হয়ে আছে। যেকোনো দিকে অর্ধ বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত, পুনঃদখলিকৃত এবং সকলের দ্বারা অবহেলিত এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে মাইলের পর মাইলব্যাপী—ছয়শ বছরের প্রাচীন সৌধ ও অট্টালিকার সারি, এমন এক কালের নিদর্শন, যখন দিল্লি ছিল কন্সটান্টিনোপল ও ক্যান্টনের মধ্যবর্তী অবস্থানে বৃহত্তম নগরী। হাম্মামখানা, উদ্যান প্রাসাদ, হাজার স্তম্ভের মিলনায়তন, সুবিশাল গম্বুজ, মুসল্লিশূন্য মসজিদ, পরিত্যক্ত সুফি দরগা—মনে হয় কোনো যুগেরই ধ্বংসাবশেষের যেন শেষ নেই। ১৭৯৫ সালে লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ফ্রাংকলিন লিখেছেন, "যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দেখা যাবে উদ্যান, অট্টালিকা, মসজিদ ও কবরস্থানের ধ্বংসাবশেষ, যা থেকে দিল্লির সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। নগরীর এককালের পরিবেশ ছিল মনোরম এবং সেই বিখ্যাত নগরীকে এখন অবয়বহীন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।"

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকের অফিসাররা নগরীর বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের মাঝেই তাদের বসবাসের জায়গা করে নেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু অফিসার ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও ভাববাদী ধরনের, যারা দিল্লির দরবারে আচরিত রীতি রেওয়াজে রীতিমতো

অভিভূত ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। স্যার ডেভিড অক্টারলোনি তাদের অন্যতম। তিনি মোগল সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রণী ছিলেন। দিল্লি রেসিডেন্সিতে তার সময়ে সান্ধ্য বিনোদন হতো মোগল কায়দায়। অক্টারলোনি ভারতীয় পোশাক পরিধান করতেন এবং গালিচার ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতেন। তার একপাশে বড় একটি হাত পাখা নিয়ে দাঁড়াত একজন ভৃত্য, আরেক পাশে বড় আকৃতির একটি হুঁকা নিয়ে অপেক্ষা করত হুঁকা-বরদার। এ ব্যাপারে অক্টারলোনি একা ছিলেন না। তার অনেক ব্রিটিশ সহকর্মীও মোগল আদব-কায়দা রপ্ত করে ফেলেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ কমান্ডার ইন-চিফের স্ত্রী মারিয়া নাজেন্ট দিল্লি সফরে এসে শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের এহেন কর্মকাণ্ডে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি তার জার্নালে লেখেন, "ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও তার সহকারীরা সকলেই 'নেটিভ' হয়ে গেছেন। আমি এখন মেসার্স গার্ডনার ও ফ্রেজার সম্পর্কে কিছু কথা বলব, যারা এখনো আমাদের পক্ষে। এরা দুজনই দীর্ঘ দাড়িগোঁফ রেখেছেন। তারা গরু অথবা শূকরের মাংস ভক্ষণ করেন না এবং তারা যতটা খ্রিষ্টান, ঠিক ততটাই হিন্দু। দুজনই অতিমাত্রায় চতুর ও বুদ্ধিমান, কিন্তু ভাবপ্রবণ ও এককেন্দ্রিক। এদেশে প্রথম দিকে আসার কারণে তাদের নিজস্ব মতামত ও কিছু সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে তারা প্রায় নেটিভই হয়ে গেছে।"

ফ্রেজার আসলে আমার স্ত্রী অলিভিয়ার দূর সম্পর্কের ভাই। এ সম্পর্কে আমি পনেরো বছর আগে দিল্লি নগরীর ওপর লেখা আমার গ্রন্থ 'সিটি অব জিনস' এ বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থটির উপকরণ অনুসরণ করে পরে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছি 'হোয়াইট মোগলস', যার বিষয়বস্তু হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বহু ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ। 'দি লাস্ট মোগল' দিল্লি নগরী কর্তৃক আমার অনুপ্রেরণা ও কৌতূহলের ফসল। এ গ্রন্থের মূল বিষয় একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত যে ভারতীয় ও ব্রিটিশদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজ সম্পর্ক, যা ফ্রেজারের সময় অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, কীভাবে ও কেন তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের অধীনে ঘৃণা ও বর্ণবাদে রূপ নিল? এই পরিবর্তনের ফলাফল ছিল সিপাহি বিদ্রোহ—অন্য কোনো কারণে নয়।

ভারতীয় ও ব্রিটিশদের সহজ সহাবস্থানের পরিপন্থি হিসেবে দুটি বিষয় কাজ করেছে বলে মনে হয়। একটি হচ্ছে, ব্রিটিশ শক্তির উত্থান—কারণ কয়েক বছরের মধ্যে তারা ভারতে যে শুধু ফরাসিদের পরাজিত করেছিল তাই নয়, বরং তাদের সকল ভারতীয় প্রতিপক্ষকেও পরাজিত করেছিল। শক্তির পরিবর্তিত ভারসাম্য অতি দ্রুত ছদ্মাবরণে সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

আরেকটি কারণ ছিল, উগ্র খ্রিষ্টানদের উত্থান এবং এর ফলে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের লেখা উইলে দেখা যায়, ভারতীয় মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ তার সাথে স্থায়ীভাবে বসবাসের যে রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ছিল, এ সময়ে এসে তা পুরোপুরিই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ ভারতীয়দের স্মৃতিকথায় দেখা যায় যে, তাদের ভারতীয় বিবি অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সন্তানদের উল্লেখ পরবর্তী সংস্করণগুলো থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্যার উইলিয়াম জোনস ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতিমান ব্যক্তিরা একসময় বিশ্বাস করতেন যে 'গভীর তমসায় আচ্ছন্ন বিধর্মীরা' অথবা 'ন্যায়নীতিবোধ বর্জিত পৌত্তলিকরা' অতি আগ্রহের সাথে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ভারতীয়দের কিছুতেই আর মহান ও প্রাচীন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, বহু ইতিহাসবিদ একেবারেই খামখেয়ালিপূর্ণ মানসিকতায় 'উপনিবেশবাদ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, যেন এটি পরিষ্কারভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, এমন ধরনের কোনো শব্দ। কিন্তু এ সময়ে এর বহু ধরনের অর্থ ও সুনির্দিষ্ট পর্যায় দৃশ্যমান ছিল। ব্রিটিশদের মাঝেও একেক দলের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট রাজকীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য— যেমন, ইভানজেলিক্যাল (খ্রিষ্টবাদী) ও ইউটিলিটারিয়ান (উপযোগবাদী), যারা উপনিবেশবাদের সবচেয়ে জঘন্য পর্যায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের উগ্রতার কারণেই ভারতের প্রতি দুর্বল ব্রিটিশদের মাঝেও পরিবর্তন এসেছিল এবং মোগলদের ব্যাপারেও তারা পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর ছিল।

১৮৫০-এর দশকের প্রথম থেকেই বহু ব্রিটিশ অফিসার মোগল দরবারের বিলুপ্তির পরিকল্পনা আঁটছিল এবং ভারতের ওপর শুধু ব্রিটিশ আইন ও প্রযুক্তিই নয়, বরং খ্রিষ্টধর্মও চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা চরমে উঠে ক্রমান্বয়ে এবং ১৮৫৭ সালে তা মহীরুহে পরিণত হয়। অতএব এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিস্ফোরণ ছিল অনিবার্য। তখনকার এশিয়ার সর্ববহৎ সেনাবাহিনী বেঙ্গল আর্মির ১ লাখ ৩৯ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৭ হাজার ৭ শ' ৯৬ জন ছাড়া সবাই তাদের ব্রিটিশ প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। উত্তর ভারতের কোনো কোনো এলাকায়, যেমন অযোধ্যায় বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দেয় জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ। চারদিকে নাশকতা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে।

বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লি। উত্তর ভারতের সকল এলাকা থেকে বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। এমনকি কানপুর থেকে